দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

উপেক্ষিত শিক্ষানীতি

নীতি আছে নীতিতেই, বাস্তবে তার নেই প্রয়োগ। নীতিকে পাশ কাটিয়ে নীতিহীনতা প্রাধান্য পেলে স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। নীতি মেনে চলার আর তেমন দরকার কি? বরং স্বেচ্ছাচারিতার নিশান উড়িয়ে যথেচ্ছা কাজ চালানোই যথাযথ বলে মনে করে থাকার কারণে নীতি বিতর্কিত এক ব্যবস্থা ঘাড়ের ওপর চেপে বসে। তাতে নুইয়ে যায় ঘাড়। সেই ভার লাঘব করা হয় দুঃসাধ্য। কঠিন-কঠোর এমনই এক পরিস্থিতি বিরাজমান শিক্ষাক্ষেত্রে। কত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হলো শিক্ষানীতির মাজেজা। বলা হলো, এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার হবে শনৈঃশনৈ অগ্রগতি। সময়োপযোগী, প্রাগ্রসর ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা জোরেশোরে বলা হয়েছে সাত বছর আগে। ২০১০ সালে শিক্ষানীতি ঘোষিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বুঝিয়েছিলেন একটি যুগান্তকারী কর্মসাধন করা গেছে। কিন্তু হা হতোস্মি। সবই কাগজের অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নীতির গুণগান যারা গেয়েছেন তারা বাস্তবায়নের পথ ও পন্থা থেকে নিজেদের শত হস্ত দূরে রেখেছেন। অবশ্য এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর গত ছয়চল্লিশ বছরে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন এবং প্রতিবেদন তৈরি হলেও কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি। সর্বশেষ ২০১০ সালে বর্তমান সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির ভাগ্যে তেমনটিই ঘটতে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন প্রকাশ হয় এবং তা বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক জান্তা শাসকরা সেই শিক্ষানীতি নির্বিচারে বাতিল করে দিয়ে নতুন কিছু করার মহড়া চালিয়ে এসেছে। এরশাদ আমলে মজিদ খান কমিশনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন হয়, ফলে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন প্রণীত সর্বশেষ শিক্ষানীতি পূর্ববর্তী দুটি কমিশনের প্রণীত নীতির আলোকেই তৈরি হয়। বাস্তবমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ এই নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা, ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ পাঠদান, প্রাথমিক পর্যায়ে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন পাঠক্রম চালুর উল্লেখ ছিল। অথচ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমানে চৌদ্দটি ধারায় বিভক্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও বিভক্তি কম নয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচী ভাল নয়। পরীক্ষা পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, সরকারের অতিরিক্ত বই ও স্কুলের চাপিয়ে দেয়া সহায়ক বইয়ের ভারে ভারাক্রান্ত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষানীতিতে শিশুদের কাঁধে বইয়ের বোঝা কমানোর কথা বলা হলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ের বোঝা আরও বেড়েছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব উদ্যোগে সহায়ক পুস্তকের সংখ্যাও বাড়িয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণে শিশুদের বোর্ডের বইয়ের চেয়ে বেশি পড়তে হচ্ছে সহায়ক বই, যা কিনতে হয় চড়া দামে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত কয়েক বছর ধরেই শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর তাগিদ দিয়ে আসছেন। কিন্তু শিক্ষা কর্মকর্তাদের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করে না বলেই পাঠ্যক্রমে বিপরীত চিত্রই দেখা যাচ্ছে। সহায়ক বইয়ের নামে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক পুস্তকের মানসিক ও শারীরিক চাপে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে কোমলমতি শিশুরা। অনৈতিক আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির সুবাদে স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব বাড়তি পুস্তক শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। মূলত শিক্ষানীতিকে পাশ কাটিয়ে যে কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বৈকি। এই সুযোগে নোট-গাইড বইয়ের বাজার হয়েছে আরও সম্প্রসারিত। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর শরীরের ওজনের দশ শতাংশের বেশি ভারি ব্যাগ বহন করা যাবে না বলে গত বছর উচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছিল, তাও উপেক্ষিত। শিক্ষা প্রশাসন সম্ভবত এসব কিছুর 'থোড়াই কেয়ার' করেন। সবকিছু মিলিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যে অবস্থা দাঁড় করানো হয়েছে, তা শিক্ষানীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনেরই নামান্তর। অথচ শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে পুনর্গঠিত করা হলে সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও প্রগতির পথে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। শিক্ষা আইন-২০১৬ কার্যকর করা না গেলে 'সকলি গরল ভেল' এর নামান্তরে পরিণত হবে।

শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণে শিশুদের বোর্ডের বইয়ের চেয়ে বেশি পড়তে হচ্ছে সহায়ক বই, যা কিনতে হয় চড়া দামে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত কয়েক বছর ধরেই শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর তাগিদ দিয়ে আসছেন

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....